Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 42–47
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

কমল চক্রবর্তীর নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসীর জীবন-সংকট

রাখী গরাঁই
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া
ই-মেইল : rakhigorain70@gmail.com

Keyword
আদিবাসী জীবন, জীবন-সংকট, বন্যপ্রাণী, অরণ্য ধ্বংস, আদিবাসী বিশ্বাস-সংস্কার, প্রতিবাদ, ডাইনি-প্রসঙ্গ।

Abstract
বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের একজন ব্যতিক্রমী কথাসাহিত্যিক কমল চক্রবর্তী। সত্তরের দশক থেকেই তাঁর সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ। কমল চক্রবর্তীর বেড়ে ওঠার প্রতিবেশ থেকেই বলতে গেলে ছেলেবেলা থেকে অরণ্য- নদী-পাহাড়ের সঙ্গে থাকতে থাকতেই একপ্রকার সম্পৃক্ততা তৈরি হয়। যার প্রভাব তাঁর সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। অরণ্য অধ্যুষিত আদিবাসী মানুষদের প্রতিও তাঁর সখ্যতা জন্মে প্রায় তখন থেকেই। এজন্যই তাঁর কথাসাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে স্থান পেয়েছে এই আদিবাসী মানুষেরা। তাঁর 'লেম্বো','ধান', 'পাহাড়ু', 'বৃক্ষ', 'ভিক্টর কুজুর' প্রভৃতি উপন্যাসে যেমন আদিবাসীদের জীবন কথা উঠে এসেছে তেমনই 'শামু জোনকো' নামে গল্পসংকলনের ২৩টি গল্পের প্রায় সব গল্পই আদিবাসীদের জীবনসম্বলিত। 'মাংসা সোরেন', 'শামু জোনকো', 'মাচি ও পাগলা হাতি', 'মেলায় মানুষের রক্ত', 'কুজুর টিলার অলিক মানুষ', 'বড়-বাবুর ভুত দেখা', 'শেষ রাতের ডাইনি','হাতির দু'রকম দাঁত', 'বাংলার লৌকিক দেবতা', 'লেখক ও একজন সাঁওতাল যুবতী' ইত্যাদি গল্পে উঠে এসেছে আদিবাসীদের জীবনাচরণ, বেঁচে থাকার জন্য লড়াই, সরকার ও মাফিয়াদের বেআইনি কারবারে সাঁওতাল সোরেন মুন্ডা মাঝিদের বিপন্ন অবস্থা, তাদের ন্যূনতম চাহিদাগুলি পূরণে অপারগতা, নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে তাদের কৃষিজমি বেআইনিভাবে অধিগ্রহণ, পাহাড় ও জঙ্গল কেটে সাফ করে দেওয়া মাফিয়ারাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেওয়া, হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের বাসস্থান নিঃশেষ করে দেওয়ার ফলে আদিবাসী গ্রামে বন্যপ্রাণীদের আগমন প্রভৃতি বিষয়গুলি। তাছাড়া আদিবাসীদের খাদ্যাভ্যাস, ধর্মীয় আচার-আচরণ-বিশ্বাস-সংস্কার তাঁর ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরেও বাদ যায়নি।

Discussion
বিশ শতকের আটের দশকের অন্যতম কথাসাহিত্যিক কমল চক্রবর্তী (জন্ম ১৯৪৪)। জামশেদপুরের যে অঞ্চলে তিনি বেড়ে ওঠেছেন তার পাঁচ কিমি দূরে দলমা পাহাড় এবং এক কিমি দূরে সুবর্ণরেখা নদী। স্বাভাবিকভাবেই ছেলেবেলা থেকে এই নদী পাহাড় এবং অরণ্যের প্রতি তাঁর এক সম্পৃক্ততা তৈরি হয়। যা তাঁর সাহিত্য ও ব্যক্তিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে।

কমল চক্রবর্তীর একাধিক উপন্যাস ও ছোটগল্পে অরণ্য-পাহাড়-নদী-বন্যপ্রানীদের কথা বিশেষ করে তাদের বিপন্নতার কথা, সভ্যতাগর্বী মানুষের করাল ছায়া যেমন এদের উপর এসে পড়েছে তেমনই অরণ্যকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকা আদিবাসী মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা উঠে এসেছে। তাঁর 'ভালোপাহাড়' নামে প্রতিষ্ঠানের গা বেয়ে ছুঁয়ে থাকা আদিবাসী গ্রাম এবং আদিবাসীদের তিনি খুব কাছের থেকে দেখেছেন, তাদের সাথে থেকেছেন, তাদের সুখ-দুঃখ-ব্যাথা-বেদনাকে অনুভব করেছেন। যদিও ভালোপাহাড় নামে অরণ্যভূমিটি সৃষ্টি করার অনেক আগে থেকেই সেই দলমারেঞ্জ অধ্যুষিত আদিবাসী মানুষদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ়তা তৈরি হয়। সমাজের মূল ধারা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানকারী এই সব মানুষদের অস্তিত্ব রক্ষার সংকটকে তিনি নিজের সংকট বলেই জেনেছেন এবং যা পরবর্তী ক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাস-ছোটগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। এই আদিবাসীদের জীবন সংকটের কথা তাঁর ছোটগল্পে কীভাবে উঠে এসেছে, তা তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব।

কমল চক্রবর্তীর 'শামু জোনকো' নামে গল্পসংকলনটির গল্প সংখ্যা ২৩টি। এই গল্পসংকলনের প্রায় সব গল্পই আদিবাসীর জীবন নিয়ে লেখা। এর মধ্যে 'মাংসা সোরেন', 'শামু জোনকো', 'মাচি ও পাগলা হাতি' এবং 'বড়-বাবুর ভূত দেখা' এবং 'মেলায় মানুষের রক্ত' এই পাঁচটি গল্প আমাদের আলোচনার মধ্যে থাকবে। 'মাংসা সোরেন' (শারদীয়া পরিচয়, ১৩৯৩) গল্পটি আদিবাসীদের জলা-জমিকে সরকারের অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নিয়ে রচিত হয়েছে। ছেঁদাপাহাড়ি গ্রামে মাংসা সোরেনের বাস। যিনি পনেরো বছর ফৌজিতে কাজ করেছেন। বাইশ বছরের স্বামী পরিত্যক্তা তার মেয়ে কুরথি। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে ছেঁদাপাহাড়ি গ্রাম। সেই নদী তীরের একমাত্র ফসল ধান যা ওই অঞ্চলের মানুষের প্রধান খাদ্য। সরকার সুবর্ণরেখা নদীতে বাঁধ দেওয়ার জন্য আশেপাশের ধানী জমিগুলিকে অধিগ্রহণ করতে চায়। এক বিঘা জমির জন্য মাত্র দু'শো টাকা খোরপোশ দিয়ে সরকার আদিবাসীদের জমিগুলো কিনে নিতে চাইলে মাংসা বলেন -

> "আদিবাসী টাকা চায় না, জমি চায়।"[১]

মাংসা সোরেন দীর্ঘদিন ফৌজিতে কাজ করেছেন অথচ ঘরে ফিরে দেখছেন তাঁর দেশ, তাঁর গ্রাম জলের তলায় চলে গেছে। বিডিও অফিস, ইঞ্জিনিয়ার ওভার্সিয়ারদের কাছে গিয়ে কোনও লাভ হয় নি, রক্ষা করতে পারেনি নিজের গ্রামকে, জমিকে। প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন, বিডিও অফিস পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার আগেই টিরকি সাহেবের পাঁচটি বুলেট ভেদ করে তাঁর শরীরে। বিদ্রোহী মাংসা সোরেন নিহত হন, তিন ব্যক্তি আহত। সেই মৃত মাংসা সোরেনের লাশকে পাঁচদিন ধরে আগলে বসে আছে কন্যা কুরথি। ছোটবেলায় বাবার শোনানো এক কাহিনিকে বিশ্বাস করে আগলে রাখে বাবার লাশ। তার মনে হয় কাহিনির রাজার ছেলের মতো তার বিদ্রোহী বাবাও একদিন মাটির তল থেকে বেঁচে ওঠে অত্যাচারীদের শাস্তি দেবে। রাজার ছেলের মতো বাবাকে না পুড়িয়ে তার শোবার ঘরের নিচে পুঁতে ফেলবে। বাবা পুনর্জীবিত হবেন এই আশায় পাঁচদিনের পচা লাশকে নিয়ে তিনদিন ধরে কোদাল খুরপি দিয়ে গর্ত করে চলেছে কুরথি। গল্পটিতে একজন আদিবাসীর আত্মত্যাগ ও তাঁর পুনরায় বেঁচে ওঠা নিয়ে যে বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে তা আসলে আদিবাসীদের মনে জেগে থাকা আশাটিকেই যেন ব্যঞ্জিত করেছে।

'শামু জোনকো' (বিভাব, এপ্রিল ১৯৮৪) গল্পের মূল বিষয় হল জঙ্গল কাটা, বন্য পশু হত্যা করার এবং অকারণে আদিবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের প্রতিবাদ। বত্রিশ বছরের পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চির কালো জাগুয়ারের মত দেহ, মাথায় কোঁকড়া চুল শামু জোনকোর। সে কানু দেওগম, রাজা সোরেন, মাটকু হেমব্রম, বাইজু মুরমুদের নেতা। অযোধ্যা পাহাড় সংলগ্ন ছোট-বড় টিলার মাঝখানে কোকচো গ্রামে শামুর বসবাস। অযোধ্যা জঙ্গলমহলের জঙ্গল বড় বড় মাফিয়াদের হাতে জঙ্গল দিন দিন সাফ হয়ে যাচ্ছে। লেখকের কথায় -

> "জঙ্গল ক্রমশ শেষ হয়ে যাচ্ছে। গ্রামগুলি ঘিরে যে ছায়া ছিল সে সব তো কবেই শেষ। এখন গ্রামের পথ, পাশের ডুংরি সব সাদা। ভারী জঙ্গলের দিকে বাবুদের হাত ঘুরছে, নাড়ুও পাচ্ছে। শা, বিজাশাল, করম, কাঞ্চন সব প্রায় শেষ। সঙ্গে বাঘ, ভালু, হরিণ, খরগোশ, ময়ূর, বন-বরা, তিতির, হরিয়াল, সব পশু বাবুরা খেয়ে ফেলেছে...।"[২]

ফরেস্টার, রেঞ্জার বা ফরেস্ট গার্ডদের পয়সা দিয়ে মাফিয়ারা বা বাবুরা জঙ্গলকে একেবারে লুঠে নিচ্ছে এই জঙ্গল কাটার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল শামু জোনকো। কয়েকদিনের মধ্যেই ছিল তাদের সারহুল উৎসব। ইতিমধ্যেই পুলিশের বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যায় শামুর মাথা। আদিবাসীরা জঙ্গলের সন্তান। শাল গাছ তাদের কাছে দেবতা সমান। শাল ফুলে হবে তাদের সারহুল উৎসব। জঙ্গলের সন্তান আদিবাসীরা তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনে গাছ থেকে ফুল-পাতা-ফল-কাঠ সংগ্রহ করে কিন্তু এখন আদিবাসীরা জঙ্গলে হাত দিলেই হয় জেল নয় পুলিশের ডান্ডা। আদিবাসীরা তাদের জঙ্গলের বিনিময়ে সমস্ত কিছুই যেমন লোহা তামা অভ্র কয়লা দিতে রাজি কিন্তু জঙ্গলে ঢুকলেই গার্ডরা তাদের ধরে নিয়ে যায়, অত্যাচার করে, গুলি করে, নারীদের ধর্ষণ করে। জঙ্গল কাটার বিরুদ্ধে শামু জোনকো তার দলবল নিয়ে কাছারিতে যান, অনুনয়-বিনয় করেন। শামু বলেন -

> "হুজুর জঙ্গল নষ্ট হলে তোমাদেরও কষ্ট। জল হবে না, ছায়া হবে না... এখন দেখো রোজ হাতি আসে। দুমুঠা ডাহিগড়া লাগাবো কি হাতি আসবে। তো আমাদের কি করা যায় বাবুরা? তোমরা ভাব। ভাবে বলো যে আদিবাসী ঝুট বলছে। গলত আছে।"[৩]

এরপরই বাবুরা স্কুল, চাকরি-বাকরি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ড্যাম হবে বলে নিছক প্রতিশ্রুতি দেয় তাদের। অথচ সেই বাবুরাই আবার জিপগাড়ি ভর্তি করে গাছ কেটে নিয়ে যায়। শামু গত দশ বছর ধরে গিট্টিকলে পাথর ভাঙ্গার কাজ করেন। প্রতি শনিবার বাড়ি ফেরেন। প্রতিদিন দেখতে পান গত দশ বছরে ধীরে ধীরে কিভাবে জঙ্গল শূন্য হয়ে গেছে। শুধু গাছ নয় পাহাড় কেটে নেওয়া হচ্ছে। পাহাড়ি নদীর ঝরঝর বা বন মোরগের ডাক আর শুনতে পাওয়া যায় না। এইসব ভেবে শামু ভেতরে ভেতরে অসন্তুষ্ট ও দুঃখী হয়ে পড়েন। হঠাৎ একদিন (শনিবার) বাস থেকে নেমে বাড়ি আসার পথে জঙ্গলে শুনতে পান লালমনি নামে এক সতের-আঠার বছরের যুবতী গলায় দড়ি দিয়েছে। সোনাঝুরির জঙ্গলে যেখানে সে আগের দিন কাঠ সংগ্রহের জন্য গিয়েছিল। কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে সে ফরেস্টগার্ড পুলিশের হাতে পড়ে যায়। কাঠচোর হিসেবে পুলিশটি লালমনিকে ধর্ষণ করে। এই অবিচার সহ্য করতে না করার প্রতিবাদে পুলিশের ছাউনি তীর ধনুক নিয়ে ঘেরাও করে শামু জোনকো ও তার দলবল। যার পরিপ্রেক্ষিতে শেষে পুলিশের তিনটি বুলেট ঝাঁজরা করে দেয় শামু জোনকোকে। এইভাবে নিয়তির নির্মম পরিহাসে কত প্রতিবাদী শামু জোনকো হারিয়ে যাচ্ছে তার খবর সভ্যসমাজ কোনদিনও রাখে না।

'মাচি ও পাগলা হাতি' (দেশ, মে ১৯৮৩) গল্পে হাতি সম্পর্কে আদিবাসীদের বিশ্বাস, জঙ্গল কাটার ফলে হাতিদের বিপন্ন অবস্থা, ডাইনি সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়গুলি উঠে আসছে। চিনিবাস কুইরির একমাত্র ছেলে গঙ্গারাম ১৫ বছর পর জন্মায়। বয়স তিন বছর। জন্ম থেকে ছেলেটি জড়। কানে শুনতে পায় না এবং কথা বলতেও পারে না। গ্রামে এক প্রবীণ মানুষ, লায়া বুড়ো নামে পরিচিত। যার মতে, তাদের গণেশ বাবা অর্থাৎ হাতি গত দুসন থেকে ক্ষুধায় রয়েছে বলে তার অভিশাপে আজ চিনিবাসের ছেলে জন্ম থেকে দুর্বল, বোবা। জঙ্গলের অভাবে হাতিরা আজ অতিষ্ঠ এমনকি তাদের মুখের খাবার কেড়ে নিচ্ছে গ্রামের মানুষরা, অত্যাচার করছে, মারছে। চিনিবাস গ্রামের রাজা বলেই হাতিদের সমস্ত অভিশাপ বা পাপ লাগছে তার উপর, তার ছেলের উপর। তাছাড়া গত দুই সন বৃষ্টি হয়নি বলে গ্রামবাসীরা এমনকি চিনিবাস বলির পর বলি দিয়ে যাচ্ছে অথচ কোন ফল হচ্ছে না। পেটের আগুনে গ্রামের মানুষ সমস্ত উজাড় করে বন্ধক দিয়েছে চিনিবাসকে। মাঝে মাঝে পুরুলিয়া, আদ্রা বা সুন্দরবন থেকে ইট ভাটার কাজ পেলে দলে দলে গ্রামবাসীরা গ্রাম ছাড়তে শুরু করে। আসলে দিনের পর দিন দলমা, কালাঝোর বা গবরিয়া অঞ্চলের জঙ্গল শেষ হয়ে আসছে। হাতি তার খাদ্য ও বাসস্থানের জায়গা হারিয়ে ফেলছে বলে তারা গ্রামবাসীর ধানক্ষেত বা গমক্ষেতে ঢুকে পড়ছে ক্ষুধা মেটানোর জন্য। কিন্তু গ্রামবাসীরাও অতিষ্ঠ। তারা বিডিও অফিস থেকে কেরোসিন পটকা পায়, হাতি তাড়ানোর ক্ষেত্রে এতে সুবিধা হয়। সারারাত জেগে টর্চ মশাল জ্বালিয়ে পটকা ফাটিয়ে কেনস্তারা বাজিয়ে হাতি তাড়ায় -

> "দেবতার রাগে গরজায়, ধান খেতে পারে না, মশালের আগুন দেবতা খুব পছন্দ করে না, আর পটকার আওয়াজও এত বীভৎস যে ভয়ে দেবতা জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে সারারাত। ভয়ঙ্কর চিৎকারে আকাশ ফাটায়। লোকজন সকালে গিয়ে দেখে ডালপালা ভাঙ্গা অবিন্যস্ত জঙ্গল। কখনও দিনদুপুরে কাঠ কুড়োনিকে একা পেয়ে দেবতা পাথরে আছড়ে মেরে প্রতিশোধ নেয়।"[৪]

এভাবে জঙ্গলের দেবতা গণেশ বাবার সাথে গ্রামবাসীদের একটা ব্যস্ত সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামের রাজা চিনিবাসেরও এতদিন দেবতার কথা মনে পড়ে নি আজ যখন তার ছেলে জড় হয়ে জন্মালো তখন তার সংজ্ঞা হয়। যদিও সব দোষ সে গ্রামবাসীদের ওপর চাপিয়ে দেয় কেননা গ্রামবাসীরা এখন আর হাতিকে দেবতা হিসেবে দেখে না, গালি দেয়, মশাল বা পটকা দিয়ে তাড়ায় বলে হাতি অভিশাপ দেয়, পাপ হয়। চিনিবাস মনে প্রানে চায় গ্রামবাসী আর হাতিদের লড়াই চলতে থাকুক, গ্রামবাসীরা মরে যাক কারণ হাতিদের খেতে দেয় না বলেই পাপ তার উপরে পড়ে। কানু, সফল, নিতাই এদের পুলিশ ধরুক হাতি মারার অপরাধে এই চক্রান্ত সে মনে মনে আঁটে, চিনিবাস বা তার সাকরেদ সামুদের বিশ্বাস যদি গণেশ ভগবান বা হাতি বাদনা পরবের দিন ক্ষেতে গিয়ে ধান খেতে পারে তাহলে তাদের ছোটবাবু গঙ্গারাম আবার কথা বলতে পারবে, হাঁটতে পারবে। পাপ থেকে মুক্তি পাবে। তাই চিনিবাস চক্রান্ত করে বাদনা পরবের দিন হাতিগুলোকে গ্রামবাসীদের ধান ক্ষেতে ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে বিডিও অফিসারদের অলক্ষ্যে, যাতে তারা বুঝতে না পারে চিনিবাস এসব কাজ করিয়েছে। চিনিবাস সামু, মুরকু এবং পবনকে আগেভাগেই জঙ্গলে পাঠিয়ে দেয় হাতিদের ধানক্ষেতে ঢোকানোর উদ্দেশ্যে। এইসময় গ্রামের মানুষ উৎসবে দুদিন ব্যস্ত থাকে। এ সময়ই সামুরা মশাল নিয়ে কাঁদু বাঁধ থেকে হাতিগুলিকে খেদিয়ে ধানক্ষেতের দিকে নিয়ে আসতে থাকে। এমন সময় মাচি দেখতে পেল সেই উদভ্রান্ত হাতিরদল ধানক্ষেতে নামছে। মাচি একজন মেয়ে-মানুষ। গ্রামের লোক তাকে মাচি ডাইনি আখ্যা দিয়েছে। গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে লতাপাতা চালের নিচে তার বাড়ি। তার ঘরের লাগোয়া কোন ঘর নেই কারণ সে ডাইনি। জীর্ণ পাকানো শরীর, গায়ে মাথায় উকুন, খেতে না পাওয়া নষ্ট চেহারা। যৌবনে মাচি ছিল বুনো আগুন। বহুধা মুকুলিত তার চেহারা ছিল ফলে সে গ্রামের যুবকদের ভোগ্যপণ্য হয়ে যায়। তাকে কেউ বিয়ে করেনি। সে স্বৈরিনী বা গণিকার মতো জীবনযাপন করত। কত বিডিও, এসডিও, ফরেস্টার তার সাথে রাত্রি যাপন করেছে। ফলে সে একসময় গ্রামের লোকেদের কাছে বিষ হয়ে উঠল। গ্রামের পুরুষদের যৌবন দিয়ে বশীভূত করে বলে সে ক্রমশ ডাইনি হয়ে উঠল। তাছাড়া দু সন জলের অভাবে চাষবাস না হওয়াটাও যে মাচির দোষে ঘটেছে কারণ সে ডাইনি এবং দ্রুত যৌবন শেষ হওয়াতে তাকে এখন জরা গ্রাস করেছে। তাই এখন সে গ্রাম থেকে পরিত্যক্তা। আবার এই মাচিই গ্রামের ধান ক্ষেতের ফসল বাঁচাতে হাতির পালের সামনে দাঁড়ায়। মাচি হাতিদের আর্তি জানায়, প্রণাম করে ধান খেতে না নামার জন্য কিন্তু হাতিগুলি মাচিকে সামনে পেয়ে শুঁড় দিয়ে পেঁচায়, শেষে আছড়ে পিষে মা। লেখকের ভাষায় -

> "ধানের হলুদে সবুজে ডাইনির নোংরা রক্ত ছিটিয়ে ফিরে যায়। নষ্ট মেয়ে মানুষের মাচির পচা মাংস, রক্ত, ছেঁড়া কানি, মাথার জটা, উকুন, টুকরো পাঁজরা দেবতার জন্য নিবেদিত হয়।"[৫]

একঘরে করে রাখা সেই ডাইনিই গ্রামের ফসল রক্ষা করতে আত্মনিবেদিত হয়।

'বড়-বাবুর ভূত দেখা' (আজকাল, মে, ১৯৮৫) গল্পে মহালি নাগ তিন পুরুষের কনভার্টেড খ্রিস্টান। তার দুই ছেলে যোসেফ ও বিদর। যোসেফের স্ত্রী সীতা এবং চার বছরের পুত্র অনিল। যোসেফ গিট্টিকলে কুলির কাজ করত। যোসেফ ছিল আদিবাসীদের সর্দ্দার। ভাই বিদর দেখতে অনেকটা যোসেফের মত। কালো, বেঁটে, পাকানো, মাথায় তেল চুল, দাঁত আর সাদা চোখ। যোসেফকে খুন করা হলে তার ভাই বিদর বড়বাবু যাদবের কাছে চাকরি চাইতে যায় যোসেফের মৃত্যুর দেড় মাস পর। যোসেফরা, যে গ্রামে থাকত সেই অঞ্চলটি লাল পাথরের খনি অঞ্চল সেখান থেকে ডিনামাইড দিয়ে খনি থেকে লালপাথর বা লোহাপাথর উত্তোলন করা হত এবং বুলডোজার দিয়ে চলত ধ্বংসলীলা। সেখানে কাজ করতো গ্রামাঞ্চলের লোকজন। যোসেফ ছিল তাদের নেতা। পঞ্চাশ বছর আগে ইংরেজরাজে এই অঞ্চল থেকে লোহা পাথর তুলতে এসেছিল সাহেবরা। তখন ঘন জঙ্গল ছিল, নানা বন্যপ্রাণীর বাস ছিল এখন তা ক্রমে বিলুপ্তির পথে। এখন সেখানে কলোনি বসেছে, চার্চ হয়েছে, মন্দির হয়েছে। মহালি নাগের বাবা বস্তা নাগ সেই থেকে খ্রিস্টান। ১৮ই মে, মাইনসের গোল্ডেন জুবিলীর দিন গোটা কলোনি নানাভাবে সেজেছে অথচ যারা কোয়ার্টার পায়নি, দূরের পাহাড়ে থাকে তাদের তীব্র জলকষ্ট। পাহাড়ের ওপরে অফিসার ক্লাব নানা রঙিন ডুম ও মার্কারি ভেপারে সেজেছে। নাচনি এসেছে, ক্যামেরায় বন্দী ক্লাবটি। অথচ পাহাড়ের কোলের শ্রমিক আদিবাসীরা সমস্ত রকম সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বড়বাবু বা চেয়ারম্যান তাদের শুধু প্রলোভন

দেখাচ্ছেন- বিনা বেতনে স্কুল হবে, ফ্রি ডিস্পেন্সারি হবে, বস্তিতে নতুন কুয়োর ব্যবস্থা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। যোসেফ মিটিংয়ে এগিয়ে গিয়ে শুধু এক প্যাকেট করে মিষ্টির ব্যবস্থা করে দিতে বলেছিল চেয়ারম্যানের কাছে। পরে পার্সোনাল ম্যানেজার তাদের পাঁচটি করে মিষ্টি দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু সেখানে চারটি মিষ্টি থাকলে যোসেফ তার প্রতিবাদ করে। ন্যূনতম আবদারটিও তারা পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। যোসেফরা মিষ্টির প্যাকেট নেয় না। মহুয়া খেয়ে যোসেফ, কালীরাম, কুরণ ও বোদরা বাবুদের ঘরে ঢোকে। যোসেফ বিডি প্রসাদের চুলের মুঠি ধরে ঘুসি মারে। দীর্ঘ বঞ্চনার সামান্যতম প্রয়াস। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই যোসেফ ও বোদরাকে জিপের পেছনে বেঁধে রগড়াতে রগড়াতে কাজের জায়গা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। গোটা রাস্তা তাদের রক্তের চিহ্ন থেকে যায়, তাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে -

> "থানায় জ্ঞানহীন ঝুলন্ত শরীরদুটো যখন খোলা হয় দুজনেরই পায়ের দু'চারটে আঙ্গুল অনুপস্থিত।"[৬]

এরপরও লাঠি ও রাইফেলের কুদো দিয়ে অবিশ্রাম মার চলে। মহালি, সীতা ও অনিলসহ আরো পাঁচশ জন যোসেফের লাশ নিতে এলে তাদের লাশ দেওয়া হয় না। কুকুরের মত যোসেফকে হত্যা করে কুনু পাহাড়ের ঢালে মাঝারি এক পাথরের নিচে ফেলে দেওয়া হয়। এই ঘটনারই দেড় মাস পরে যোসেফের জায়গায় ভাই বিদর বহালি থাকতে চায়। অবিকল দাদার মতো দেখতে বিদরকে দেখে বড়বাবু যাদব যেন ভূত দেখে চমকে উঠল। আশ্চর্যরকমভাবে আদিবাসীদের চেহারার মধ্যে এতটাই মিল। হয়ত ভূত নয় আদিবাসীদের বাবুরা ভূত বা কদাকার জংলি মায়াবী কোন প্রাণী বলেই মনে করে। যোসেফের সাথে তারা যে অন্যায় করেছে সেই অপরাধবোধ বড়বাবুর অবচেতন মনে ঘোরাফেরা করতে থাকায় বিদরকে দেখে চমকে ওঠায় স্বাভাবিক।

'মেলায় মানুষের রক্ত' (বিভাব পত্রিকা) গল্পের প্রধান চরিত্র মুসা। সে একদিন হাঁটতে হাঁটতে সুবর্ণ রেখা নদীর দিকে এগোচ্ছিল। সেই নদীর পাশে রাজবাড়ি এবং রঙ্কিনী দেবীর মন্দির। গল্পটি মূলত এই রঙ্কিনী দেবীর পূজোকে ঘিরেই, বলা যায় আদিবাসীদের বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে রচিত। আগে একসময় রঙ্কিনী দেবীর পূজোতে কাঁড়া বলির সাথে সাথে নরবলিও দেওয়া হত কিন্তু বর্তমানে নরবলির প্রচলন নেই, সেখানে কাঁড়া, পায়রা, তিতির, খুখরা, পাঁঠা প্রভৃতি বলির প্রচলন রয়েছে। মুসা মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভাবতে লাগল মা রঙ্কিনীর পূজোতে নরবলি না হওয়ার জন্য এখন মানুষের এত কষ্ট। আগের মত বৃষ্টি হয় না, চাষবাস হয় না, রাজার মৃত্যু হয় এমনকি রাজবাড়িতে চুরিও হয় কারণ দেবী এখন মহাভোজ চান। সাত-আট বছরের শিশুর বলি চান রঙ্কিনী দেবী যা আগে দেওয়া হত। মুসা ভাবে দেবীর জন্য ভোগ চুরি করবে সে, দেবীকে মানুষের রক্তে স্নান করাবে। এ গ্রামের এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার কারণ দেবী ভোগ পাচ্ছেন না। কিন্তু এই দেবী পূজো অর্থাৎ বিনধা পরবে মানুষের লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ্য বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাত্রাপালা, নাচনি নাচ ইত্যাদি নিয়ে গ্রামের মানুষ এখন ব্যস্ত। আবার এই বিনধা পরবে সাবি তার ছেলে নুনাকে নিয়ে চার বছর পর এসেছে মেলা দেখতে। যদিও সাবির উদ্দেশ্য পুরোনো প্রেমিকদের নিয়ে মজলিসে ব্যস্ত থাকা। মুসা সাবির ছেলে নুনাকে দেখে দেবীর কাছে বলি দেওয়ার কথা ভাবে। এই ভাবনা তার মনে ঘুরপাক খায়। পূজা শুরু হয়ে গেলে মা সাবি তার প্রাক্তন প্রেমিক যাদবের সাথে রসিকতায় ব্যস্ত থাকায় নুনা মায়ের হাত ছাড়া হয়ে যায় বেখেয়ালে। নুনা হারিয়ে যায়। মুসা মা রঙ্কিনী দেবীর পূজায় রত জিতুয়া অষ্টমীর দিন। এদিকে অনেক খোঁজাখুজি করে সাবি তার ছেলে নুনাকে খুঁজে পায়। মুসা নুনাকে ভেবেছিল মায়ের কাছে বলি দেবে কিন্তু সে নিজের বিবেকের কাছে হার মেনে যায়। নুনাকে বলি দিতে পারেনি সে। মুসা যে যৌবনে বড় বড় মোষের মুন্ডু এক কোপে বলি দিতে পারতো আজ তার হাত কেঁপে উঠলো। এককোপে সে কাঁড়াটিতেও (বলি প্রদত্ত) আজ খসাতে পারেনি। আবার তার মনে ভয় দেখা দেয় যে মা হয়তো সত্যিই মানুষের রক্ত চান। শেষে মুসা নিজেকেই মায়ের কাছে বলি দিয়ে মাকে তার রক্তে স্নান করালো। খুব বিস্তৃতভাবে না হলেও গল্পটিতে আদিবাসীদের বিশ্বাস সংস্কারসহ জীবন সংগ্রামের নানা ছোট ছোট দিক উঠে এসেছে।

কমল চক্রবর্তীর বহু গল্পে এভাবে আদিবাসীর জীবন কথা উঠে এসেছে। একদিকে বৃক্ষ বা অরণ্য অন্যদিকে আদিবাসী মানুষেরা তাঁর কাছে বোঙ্গা। সত্যিই প্রকৃত ঈশ্বর তারা। যাদের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি কেড়ে নিচ্ছে সেই সভ্যসমাজের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদে সামিল তাঁর লেখনী। শামু বা মাচি বা ফুচু সিং বা মুসার মত অনেক চরিত্রই রয়েছে

যাদের গল্পকথা বেশিরভাগই বাস্তব। এই সব মানুষদের যাপন, তাদের বাসস্থান থেকে শিকড় উৎপাটন, খাদ্যাভাব, জলকষ্ট, আচার-বিশ্বাস সর্বোপরি তাদের বিপন্ন জীবনের কথা টুকরো টুকরোভাবে হলেও উঠে এসেছে তাঁর ছোটগল্পে। আরও অনেক বিষয় রয়েছে যা এই স্বল্প আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসা যায় নি। তবে একথা বলা যায় তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্প হয়ে উঠেছে আদিবাসী জীবনসংগ্রামের জীবন্ত দলিল।

তথ্যসূত্র :

১. কমল চক্রবর্তী, শামু জোনকো, প্রকৃতি ভালোপাহাড়, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৬, পৃ. ৬
২. কমল চক্রবর্তী, শামু জোনকো, প্রকৃতি ভালোপাহাড়, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৬, পৃ. ২২
৩. কমল চক্রবর্তী, শামু জোনকো, প্রকৃতি ভালোপাহাড়, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৬, পৃ. ২৪-২৫
৪. কমল চক্রবর্তী, শামু জোনকো, প্রকৃতি ভালোপাহাড়, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৬, পৃ. ৫১
৫. কমল চক্রবর্তী, শামু জোনকো, প্রকৃতি ভালোপাহাড়, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৬, পৃ. ৬১
৬. কমল চক্রবর্তী, শামু জোনকো, প্রকৃতি ভালোপাহাড়, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৬, পৃ. ৭০

সহায়কগ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা :

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ: অক্টোবর ২০১৬
২. তপোধীর ভট্টাচার্য, ছোটগল্পের সুলুক-সন্ধান (পূর্বার্ধ), দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০১৭
৩. সুমিতা চক্রবর্তী, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ: জুন ২০০৪
৪. মানস চক্রবর্তী (সম্পাদনা), আর্যপত্র, কমল চক্রবর্তী সম্মাননা সংখ্যা, বইমেলা ২০২০
৫. শতানীক রায় (সম্পাদনা), জলটুঙ্গী, ২০২২